

মানবাধ্বা সুখ ও শান্তিবন্ধী। অবহারিক বা সাংসারিক জীবন এবং পারমার্থিক বা আদিক জীবন — এই দুইটি জীবনে জীবদ্ধা মায় ও অবিন্যা উপধিগ্রহ ইয়া বিচরণ করিতেছে; বহুদিন না ধরণ সাক্ষ্যকর হয়, ততদিন ঐকান্তিক জীবনযুক্তি লাভ ইহতে পারে না। যদিও শান্তি বা নিবৃত্তিই মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য, তথাপি সুখের নেশা, সুখের স্পৃহা ও তজ্জনা নিতানিরন্তর কর্মব্যাপ্তি জীবদ্ধা পরিহার করিতে পারে না। আত্মানুকূল কেন্দ্রার ভাবই সুখ। যে কামনা-বাসনা আমাদের মনে চঞ্চলতা উৎপাদন করিয়া সেই বস্তুরাপ্তির জন্য স্পৃহা জাগিয়া দেয় এবং ক্রেশকর্ম ও বিপাকশয়ধারা পুরুষার্থে নিয়োজিত করে, পরিশেষে সেই বস্তুরাপ্তি জন্য আত্মমানের অনুকূল সংযোগস্থাপন করিয়া সামগ্রিক সমতা, স্থিরতা ও স্তব্ধতা আনিয়া দেয়, তাহাই সুখ। অবিকারশ জীবনই এই সুখদেবী। তাই সুখকে ‘ভোগ’ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

এই বহির্সুখের ইন্দ্রিয়সুখের কোথাও অবধি নাই। অগ্নিতে ঘৃতাঘতি দিলে তাহার জ্বলা ও শিখা যেমন উত্তপ্তোত্তর বৃদ্ধি পায়, সেইরূপই কামনা-বাসনা ও ভোগবহিতে যতই সুযোগকরণ ন্যস্ত করা হইবে, ততই প্রবৃত্তি, ভোগ ও মোহ এবং তজ্জনা পরিণামী তাপ, বেদনা, অপরিপূর্ণতা, অতৃপ্তি ও অসন্তোষ মানবাধ্বাকে বিকৃত করিয়া রাখিবে, কোথাও সে শান্তি পাইবে না। পক্ষান্তরে আশাতৃষ্ণার নিবৃত্তি যে পরিপূর্ণতালাভে সম্ভবপর, তাহাই শান্তি। ইহা ভোগ ও বাসনাপরাঙ্মুখ মনের নিবৃত্তির দ্বারাই সম্ভবপর — ‘মনোনিবৃত্তি পরমোপশান্তি’।

তাই বহিঃইন্দ্রিয় মনোনের প্রাকালে অন্তরবাসনা নিরন্তরের বিধান দেওয়া হয়। জ্ঞানপ্রাপ্তির বা মোক্ষপ্রাপ্তি নির্বাপনান্তের প্রথম সোপান ‘কাম’ বা অন্তরেজিরানিগ্রহ। বাসনাই কর্ম ও জেতার স্বেচ্ছা দেয়। তাই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মনোের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। ইহা ভোগের অভিজ্ঞতা ও বিচার, সংসদ ও শুদ্ধকর্ম দ্বারাই সম্ভবপর হইতে পারে, কারণ সঙ্গই আসক্তির কারণ, নিঃসঙ্গই নিরাসক্তির কারণ।

“সঙ্গ সর্ববান্নাং হেয়ং স চেৎ তাত্ত্বং ন শক্যতে,

সং সন্তিঃ সহকর্তব্যঃ সত্যং সঙ্গো হি ভেদ্যজম।”

শান্তিকামী পক্ষে নিরাসক্ত নিঃসঙ্গ জীবনই একমাত্র কাম্য ও সাধন। যদি এরূপ নিঃসঙ্গ জীবন লাভ করা সম্ভবপর না হয়, তবে তাহা সম্ভবতের সঙ্গে করাই কর্তব্য, কারণ মনোব্যাপ্তি ও ভবব্যাপ্তির একমাত্র ঔষধই এই সঙ্গ।

প্রাক্তন সৃষ্টি ও সুমার্জিত কর্মদ্বারাই এই দুর্লভ সঙ্গ মানুষ পাইতে পারে। সকল দেশেই সকল মহাপুরুষই জীবনের চরম কল্যাণপ্রাপ্তির পরমসাধনরূপে সংসদের নির্দেশ দিয়াছেন। যে সঙ্গ, যে বৃত্তি, যে বিচার মানুষের মনকে সত্ত্ব পরাঙ্মুখ করে, হিতাহিত বিবেচনাশূন্য ও আপাতঃ সুখস্পৃহ করিয়া তুলে, তাহা অশুভ, তাহা বজ্রনিয়।

“শুভাশুভাত্ম্যং মার্গাভ্যং বহন্তি বাসনাসরিং”

..... মনকে বশীভূত করাই শুরুরার লক্ষ্য, মনকে জয় করাই জরীর লক্ষ্য। কারণ মনই নিজের শত্রু, আবার মনই নিজের মিত্র। বহিঃক্রি দমন করা অন্তঃশত্রু সাহায্যে সহজ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান, বিচার, প্রজ্ঞান ও আত্মসাধনার দ্বারা মনকে বশীভূত করা অত্যন্ত দুঃসহ। কৃষ্ণব্রত, নিয়মানুবর্তিতা, তপসা ও ধ্যানসাধনা দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

“তপঃ স্বাধ্যায় ইশ্বরপ্রতিধানানি ক্রিয়াযোগঃ”

শরীরপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ জন্য স্বাধ্যায় বা অধ্যায়শাস্ত্রপাঠ ও সংসদ এবং বুদ্ধির বৃত্তি নিরোধ জন্য ইশ্বরপ্রতিধান বা ধ্যান — এই ক্রিয়াযোগ সমকালীন করা আবশ্যক। অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় সংযত হইলেই উপরতি বা আত্মব্যতিরিক্ত সকল বস্তুর প্রতি একটি বীতস্পৃহতা দেখা দিলে — ইহাই বৈরাগ্যের নামান্তর।

এই বৈরাগ্য আমাদের মনে শক্তিসম্ভার ও বলাধান করে এবং সকল বাধাবিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতার সমুদ্রীর্ণ করিবার পক্ষে বৈর্য, উৎসাহ ও আত্মভিমুখী গতির প্রতি অদমা প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। এই তিতিক্ষা ইহতেই গুরু ও শাস্ত্রবাক্যের প্রতি মুক্তিকর্তৃকহিত প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।

এই ‘প্রজ্ঞা সাধাম উপনীতে’ — প্রজ্ঞাদ্বারা বিমূঢ় না হইলে এই সংপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হইতে পারে না — ‘প্রজ্ঞাবিরহিতঃ যজ্ঞঃ তামস পরিচক্ষতে’। প্রজ্ঞাদ্বারাই মন একটিমাত্র লক্ষ্যবস্তুর সমাহিত হইতে পারে। তাই শান্তিসাধনার মূলে এই যৎসম্পত্তির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাই স্ববিগণ, জ্ঞানবাপিশি ও শান্তিসজ্জনীগণ কীর্তন করিয়াছেন।

“নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহমূত্রার্থকলভোগ বিরোগঃ”

শ্রমাদি যৎসম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা চরমশান্তি প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির একমাত্র সাধন। চরমতায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভোগ-পর্যাঙ্মুখ চিত্ত যখন সুখেচ্ছা পরিণামী করিয়া একমাত্র শান্তিকেই বরণ করিয়া লয়, তখনই তাঁদের অন্তরে মোক্ষের প্রতি তীব্র অদমা ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠা দেখা দেয়।

সুখ ও আনন্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুখ পরিণামী, বাসনা আশাতৃষ্ণ ও মোহকরক। পক্ষান্তরে আনন্দ Introspective বা স্বাধ্যায়শাস্ত্রী, অশুভ, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক। ইহা লাভ করিলেই বৃত্তির অশুভতা ও পূর্ণতা লাভ হয় এবং লভ্য বস্তুর এই আনন্দের ব্যতিরিক্ত কিছুই না থাকায় শান্তি ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ‘যত্বেদ্যবতীরেবস্যাং আত্মতৃপ্ত্য মানবঃ আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে’। অর্থাৎ আত্মরতি, আত্মতৃপ্তি ও আত্মসন্তোষ মানবচিত্তে পরিপূর্ণ শান্তি আনিয়া দেয়।

“খেলখয়ের দেওয়াল গেঁথে

খেলান নিয়ে ছিলেম মেতে।

ভিৎ ভেঙ্গে যেই চুকলে ঘরে, ঘুচলো আমার দ্বন্দ্ব

তাই ‘সুখের’ খেলা আর রোচে না পেয়েছি আনন্দ।”

এই আনন্দানুসন্ধানই পরমাধ্বা, মায়-উপাধি ও অবিন্যা-উপাধি স্বীকার করিয়া যে জীবদ্ধা হইয়াছেন,

সংসারের নানা ভোগবচিত্রা দ্বারা পরিশ্রান্ত ও প্রবুদ্ধ সেই জীবদ্ধাই এই আবৃত ও হত আনন্দ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই ব্যাকুলতাই তীব্র মুখের জাগিয়া দিয়া তাকে পুনঃ শান্তি-পারাবারে নিমজ্জিত করিয়া তার পরিচ্ছন্ন সত্ত্বকে অশু ও অপরিণামী শান্তিসত্তার মাঝে চিরতরে বিলীন করিয়া দেয়।

* * * * *

মানব যে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে, নিজাপেক্ষা অপরের মহত্ত্ব সম্পর্কে অকৃত হইয়া তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করে, তাহার প্রদর্শিত মার্গে নিজেকে পরিচালন করিবার চেষ্টা করে, এটা তাহারই অন্তরের এক বিকাশোদ্ভূত অবস্থা। সে সেই অন্তরের স্মৃতিসোদ্ভূত বৃত্তিটিকে রূপের ভিতর, গুণের ভিতর, শব্দের ভিতর প্রত্যাক করিয়া নিজেকে ভৎসন করিবার জন্য ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। অশান্তির রাজ্য হইতে চিরশান্তির ধামে উপস্থিত হইবার জন্য যে ব্যাকুলতা দেখা যায়, তাহাই বৈরাগ্যের নামান্তর এবং অনুরূপ — negative dissociation from the outward world and strangling alluring drifting attractions এবং positive association with the love of that which is sublime, soothing and enrapturing। এইরূপ transit period-এ বা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সন্ধিক্ষণেই মানবের অকতমিশ্র বহুদিনের অভ্যস্ত অজ্ঞতা, অব্যবহিক, জড়তা ও মালিন্য দূর করিবার জন্যই শ্রীগুরু ও আত্মপ্রকাশের আবশ্যক হয়। এই অশান্তিবন্ধল দেখক্রেটি ও pitfalls-পূর্ণ জড়জগৎ হইতে চিমায় শান্তিবোধকে মানবের সমগ্র বৃত্তিকে ফিরাইয়া দিবার সহায়করূপেই শান্তির অগ্রদূতরূপে গুরু ও শাস্ত্রের প্রয়োজন।

বস্তুর, শ্রীগুরু ও শাস্ত্র একই বস্তু। শ্রীগুরু অনুভূতিই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁদের নির্দেশই শাস্ত্রের অনুশাসন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শাস্ত্র সত্যানুভূতির ও সত্যানুভবিতার আক্ষরিক মূর্তি, প্রজ্ঞাপরায়ণ হইয়া শাস্ত্রানুশীলন ও তদ্বিপর্যয়সাধনে আচরণ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেও গুরুর প্রয়োজন শাস্ত্রদ্বারাও সিদ্ধ হইয়া যায়।

এই আনন্দ ও শান্তি যাহা আমাদের আত্মহ ও আত্মার স্বরূপ, তাহাকে আমরাই সংসারের বিকল্প ভাবনা, বোধ ও পরিবেশের আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছি। দুঃখ, সৈন্য, তাপ ও বিবেক — সবই সাময়িকভাবে মনে গুরুভার সৃষ্টি করিয়া আমাদের আনন্দ ও শান্তিবন্ধিত করিয়া রাখিলেও মন আমাদের সর্বদাই শান্তির জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। প্রকৃত বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণা তখনই দেখা দেয়, যখন আমরা এই সংসার ও প্রাচুর্যময়্যেও প্রকৃত শান্তি খুঁজিয়া পাই না এবং সর্বত্র পরিণাম করিয়া একমাত্র এই শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ি। এই সর্বপর্যায়কামের আনন্দই ‘ব্রহ্মানন্দ’।

আমাদের প্রতি প্রার্থনা, প্রতি পূজা, প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানেই শান্তিতে পর্যাবসান বিধায় আমাদের আদি, অন্ত ও শেষমন্ত্র — ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি

